ব্যাকরণ

ব্যাকরণ ঃ সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজনীয়তা, কাঠামো ও ব্যাকরণ চর্চা

সংজ্ঞা ঃ ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞগণ সংজ্ঞা নির্ধারণে বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। ব্যাকরণের যথার্থ পরিচয় প্রকাশের জন্য ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯০—১৯৭৭) সংজ্ঞাটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা যায়। তাঁর মতে, যে শাস্ত্রে কোনও ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি বুঝিয়ে দেওয়া হয়, সে শাস্ত্রকে বলে সে ভাষার **ব্যাকরণ**। আর বাংলা ভাষার ব্যাকরণের সংজ্ঞা সম্পর্কে তাঁর অভিমত, যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি সবদিক দিয়ে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে **বাংলা ভাষার ব্যাকরণ** বা **বাংলা ব্যাকরণ**। অবশ্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরবর্তী পর্যায়ে 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে কিছুটা পরিমার্জিত রূপে লিখেছেন, যে বিদ্যার দ্বারা কোনও ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠন ও লিখনে এবং তাতে কথোপকথনে শুদ্ধরূপে প্রয়োগ করা যায়, সে বিদ্যাকে সে ভাষার ব্যাকরণ বলে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, যে ব্যাকরণের সাহায্যে এই ভাষার স্বরূপটি সবদিক দিয়ে আলোচনা করে বুঝতে পারা যায় এবং শুদ্ধরূপে (অর্থাৎ ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে যে রূপ প্রচলিত সে রূপে) তা পড়তে ও লিখতে এবং তাতে বাক্যালাপ করতে পারা যায় সে রূপকে ব্যাকরণ বোঝায়।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫—১৯৬৯) তাঁর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে বাংলা ব্যাকরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, যে শাস্ত্র জানলে বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় তার নাম **বাংলা ব্যাকরণ**।

ডঃ সুকুমার সেন (১৯০০—৯২) তাঁর 'ভাষাপ্রবেশ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা' বইয়ে ব্যাকরণের সংজ্ঞা নির্ধারিত করেছেন এভাবে, যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতির বিচার ও বিশ্লেষণ আছে এবং যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকলে বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে বলতে, লিখতে ও শিখতে পারা যায়, তাকে **বাংলা ভাষার ব্যাকরণ** বলে।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের (১৯০২—৮২) মতে, যে শাস্ত্রের দ্বারা ভাষাকে বিশ্লেষণ করে এর বিবিধ অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় এবং ভাষা-রচনাকালে আবশ্যকমত সেই নির্ণীত তত্ত্ব ও তথ্য প্রয়োগ সম্ভবপর হয়ে ওঠে, তার নাম ব্যাকরণ।

'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বইয়ে মুনীর চৌধুরী (১৯২৫—৭১) প্রমুখের মতে ব্যাকরণের সংজ্ঞা ঃ যে শাস্ত্রে কোন ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে **ব্যাকরণ** বলে। তাঁদের মতে, যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষিত হয় এবং এদের সুষ্ঠু প্রয়োগবিধি আলোচিত হয়, তা-ই বাংলা ব্যাকরণ।

এসব সংজ্ঞা থেকে ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং তার বিশুদ্ধ রূপ রক্ষার নিয়মকানুনই যে ব্যাকরণ তা অবহিত হওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে ডঃ হুমায়ুন আজাদ মন্তব্য করেছেন, 'এখন ব্যাকরণ বা গ্রামার বলতে বোঝায় এক শ্রেণীর ভাষা বিশ্লেষাত্মক পুস্তক, যাতে সন্নিবিষ্ট হয় বিশেষ বিশেষ ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগের সূত্রাবলী।'

বৈশিষ্ট্য ঃ 'ব্যাকরণ' শব্দের অর্থ 'বিশেষভাবে বিশ্লেষণ'। শব্দটি গঠিত হয়েছে এভাবে ঃ বি + আ + কৃ বা কর্ + অন অর্থাৎ 'বিশেষ এবং সম্যকরূপে বিশ্লেষণ করা'। ব্যাকরণ বিদ্যার বই সাধারণত 'ব্যাকরণ' কথাটি দিয়ে বোঝানো হয়।

ইংরেজি গ্রামার শব্দের সাথে বাংলা ব্যাকরণ শব্দের মিল রয়েছে। গ্রামার শব্দটি গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে—যার অর্থ—'শব্দশাস্ত্র'। 'শুদ্ধ বর্ণ বিন্যাস বিদ্যা' অর্থে কথাটির প্রাচীন প্রয়োগ ছিল। শব্দভিত্তিক আলোচনা বলে বাংলা ব্যাকরণের সাথে তার মিল বিদ্যমান।

ব্যাকরণের মধ্যে ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে। ভাষার গতি-প্রকৃতি, তার স্বরূপ, ধরন-ধারণ ব্যাকরণে রূপ লাভ করে। ভাষাব বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাকরণ থেকে ধারণা লাভ করা যায়। ভাষার দীর্ঘদিন ব্যবহারে যেসব রীতি প্রচলিত হয়েছে তার বিশ্লেষণই ব্যাকরণের বিষয়বস্তু। ভাষা সৃষ্টি হয়েছে আগে, ব্যাকরণ এসেছে ভাষার পথ ধরে। ভাষা ব্যবহারের ফলে যখন বিশেষ কিছু নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে তখন তা হয়ে উঠেছে ব্যাকরণের বিষয়। ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন ভাষাকে বিশুদ্ধ রাখতে সহায়তা করে। সেজন্য ব্যাকরণকে ভাষার সংবিধান বলা হয়। তবে ব্যাকরণ ভাষাকে অনুসরণ করে। ভাষা ব্যাকরণকে অনুসরণ করে না। ভাষার বিশুদ্ধতার জন্য ব্যাকরণের সহায়তা প্রয়োজন। কিন্তু ভাষা নিজের গতিতে চলে বলে কখনও কখনও ব্যাকরণের বিধিবিধান অতিক্রম করে যায়। আর তখন সে ব্যতিক্রমকে ব্যাকরণ স্বীকার করে নেয়। ভাষায় এমন কিছু প্রয়োগ আছে যা ব্যাকরণগত দিক থেকে ভুল। কিন্তু ভাষায় ব্যবহারে গ্রহণযোগ্যতার জন্য সে ভুলও শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়।

ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলার আলোচনাই ব্যাকরণ। ব্যাকরণের সাহায্যে ভাষার বিশুদ্ধ রূপ বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। তাই বলে ব্যাকরণ ভাষাকে শাসন করে না, বরং ভাষাই ব্যাকরণকে শাসন করে।

প্রয়োজনীয়তা ঃ ভাষায় কখনও স্বেচ্ছাচারিতা স্থান পেতে পারে না। সেদিক থেকে ব্যাকরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন জানা না থাকলেও সাধারণ মানুষের মনোভাব প্রকাশ হয়ত সম্ভব হয়। কিন্তু ভাষার মর্যাদা রক্ষা করে বিশুদ্ধরূপে প্রয়োগের জন্য ব্যাকরণের আবশ্যকতা রয়েছে। ব্যাকরণ জানা না থাকলে ভাষা বিশুদ্ধ রাখা যায় না। মনের ভাব প্রকাশের জন্য কথা বলা, লেখা, পড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশুদ্ধতা রক্ষা করা প্রয়োজন। ব্যাকরণের নিয়ম জানা থাকলেই এই বিশুদ্ধতা রক্ষা সহজ। ভাষার মাধুর্যময় ও সার্থক ব্যবহারের জন্য ব্যাকরণ জানতে হয়। ভাষায় বিশুদ্ধতার জন্যও ব্যাকরণ আবশ্যক। সাহিত্যের ছাত্রদের জন্যও ব্যাকরণের জ্ঞান থাকার গুরুত্ব রয়েছে। ভাষার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করার মাধ্যম হল ব্যাকরণ। ভাষা গঠন, নিহিত সাহিত্যরস, শব্দ ব্যবহার ও তার তাৎপর্য অনুধাবন প্রভৃতি ব্যাকরণের মাধ্যমে লাভ করে সাহিত্যের ছাত্ররা সাহিত্য সৃষ্টি ও উপভোগে উপকৃত হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন, 'আলো, জল, বিদ্যুৎ, বাতাস প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য না জানিয়াও মানুষ বাঁচিয়াছে, বাঁচিতেছে ও বাঁচিবে। কিন্তু, তাই বলিয়া ঐ সমস্ত বস্তুর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যকে মানুষ অস্বীকার করিয়া বর্তমান সভ্যতার গগন বিচুম্বী সৌধ নির্মাণ করিতে পারা যায় নাই। ব্যাকরণ না জানিয়াও ভাষা চলিতে পারে ; কিন্তু ভাষাগত সভ্যতা না হউক, অন্তত ভব্যতার পত্তন বা সমৃদ্ধি হইতে পারে না। ব্যাকরণ না জানিলে ভাষাগত আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে হয় বলিয়া ভাষা উন্নত প্রকৃতির ভাবের বাহন হইয়া শীলতা সম্পন্ন সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে না। এই জন্যই শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞানের সহিত বিশেষ জ্ঞানও আবশ্যক।'

কাঠামো ঃ ভাষার বিচিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যাকরণের বিকাশ। মানব মনের ভাব প্রকাশক একটি বাক্যের মধ্যে ব্যাকরণের নিয়মকানুনের পরিচয় মিলে। বাক্য মনোভাব প্রকাশের পূর্ণাঙ্গ রূপ। বাক্য ভাঙ্গলে পাওয়া যায় পদ। পদের আগে আছে শব্দ। শব্দের বিশ্লেষণে পাওয়া যায় বর্ণ বা ধ্বনি। স্তরগুলো এভাবে বিন্যাস করা যায় ঃ

১. ধ্বনি বা বর্ণ, ২. শব্দ ও পদ এবং ৩. বাক্য। ধ্বনি হল ভাষার মূল ভিত্তি। ধ্বনির প্রতীক বর্ণ, বর্ণ মিলে গঠিত হয় শব্দ। শব্দের সাথে বিভক্তি যুক্ত হয়ে গঠিত হয় পদ। কতগুলো পদ মিলে বাক্য। ভাষার এইসব স্তরের আলোচনা নিয়েই ব্যাকরণ। ব্যাকরণে ধ্বনি বা বর্ণের আলোচনাকে বলে ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দ ও পদের আলোচনাকে বলে শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব। আর বাক্যের আলোচনাকে বলে বাক্যতত্ত্ব। তাই ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব এবং বাক্যতত্ত্ব নিয়েই ব্যাকরণের কাঠামো গড়ে উঠেছে। তবে এই কাঠামোর মধ্যে ছন্দ ও অলঙ্কার স্থান দেওয়ার পক্ষে কেউ কেউ মত ব্যক্ত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞগণের মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ব্যাকরণের কাঠামোর মধ্যে পাঁচটি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সেগুলো হল ঃ ১. ধ্বনি প্রকরণ, ২. শব্দ প্রকরণ, ৩. বাক্য প্রকরণ, ৪. ছন্দ প্রকরণ ও ৫. অলঙ্কার প্রকরণ।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণের কাঠামো নির্ধারণ করেছেন এভাবে ঃ

১. বর্ণ ও ধ্বনি (ধ্বনিতত্ত্ব), ২. পদ, ৩. শব্দ (রূপতত্ত্ব) এবং ৪. বাক্যতত্ত্ব। এর সাথে তিনি ছন্দ ও অলঙ্কার স্থান দিয়েছেন।

ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে তার কাঠামো নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

১. ধ্বনিতত্ত্ব ঃ এতে থাকবে ধ্বনির বিভিন্ন দিক—বর্ণ প্রকরণ, বর্ণের উচ্চারণ, বর্ণবিন্যাস, সন্ধি, ণত্ব ও ষত্ববিধান ইত্যাদি।

২. শব্দতত্ত্ব ঃ এতে থাকবে শব্দ ও পদের নানা দিক—শব্দ গঠন, পদ পরিচয়, লিঙ্গ, বচন, শব্দ ও ধাতুরূপ, কারক, সমাস ইত্যাদি।

৩. বাক্যতত্ত্ব ঃ এতে থাকবে বাক্যগঠন, বাক্যবিশ্লেষণ, বাক্যের প্রয়োগ ইত্যাদি।

শ্রেণীবিভাগ ঃ ব্যাকরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণকে—১. বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ, ২. ঐতিহাসিক ব্যাকরণ, ৩. তুলনামূলক ব্যাকরণ ও ৪. দার্শনিক বিচারমূলক ব্যাকরণ—এই চার ভাগে ভাগ করেছেন।

১. বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ ঃ এই শ্রেণীর ব্যাকরণে ভাষার ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যের বিভিন্ন দিক—ভাষার স্বরূপ ও প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়। বিশেষ কোন যুগে কোন একটি ভাষার রীতি ও প্রয়োগ বর্ণনা করা এই শ্রেণীর ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য। এই শ্রেণীর ব্যাকরণের কাজ সেই বিশেষ কালের ভাষা যথাযথ ব্যবহার করতে সাহায্য করা।

২. তুলনামূলক ব্যাকরণ ঃ এই শ্রেণীর ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ভাষাগত আধুনিক বা কোন নির্দিষ্ট যুগের প্রয়োগ আলোচনাকালে অন্য ভাষার প্রয়োগ ও রীতির সাথে মিলিয়ে দেখা।

৩. ঐতিহাসিক ব্যাকরণ ঃ এই শ্রেণীর ব্যাকরণের ভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে ভাষার রূপটির উৎপত্তি ও বিকাশের ঐতিহাসিক ধারা নির্ণয় করা হয়।

৪. দার্শনিক বিচারমূলক ব্যাকরণ ঃ এই শ্রেণীর ব্যাকরণের উদ্দেশ্য হল ভাষার অন্তর্নিহিত চিন্তাপ্রণালীকে ধরার চেষ্টা করা এবং সেই চিন্তাপ্রণালীকে অবলম্বন করে, সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে কি করে ভাষার রূপের উৎপত্তি ও বিবর্তন ঘটে থাকে, তার বিচার করা।

বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ বা সাধারণ ব্যাকরণ হচ্ছে ভাষা-শিক্ষার পদ্ধতি বা সাধন অথবা শব্দানুশাসন ; তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণ হল ভাষাবিজ্ঞান এবং দার্শনিক-বিচারমূলক ব্যাকরণ হল ভাষাবিষয়ক দর্শন।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের মতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ তিন প্রকারের ঃ ১. ঐতিহাসিক ব্যাকরণ, ২. তুলনামূলক ব্যাকরণ ও ৩. ব্যবহারিক ব্যাকরণ। বাংলা ভাষায় প্রায় সমস্ত ব্যাকরণই ব্যবহারিক প্রকৃতির।

ব্যাকরণ চর্চা ঃ ব্যাকরণের চর্চার ইতিহাস সুদীর্ঘ দিনের। ভারতবর্ষের ব্যাকরণ চর্চা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনায় প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণ অপূর্ব চিন্তা, বিজ্ঞান ও গবেষণার পরিচয় দান করেছেন। প্রাচীন ভারতের কথ্য ভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষাগুলোর ব্যাকরণও বিশেষ পাণ্ডিত্যের সাথে রচিত হয়েছিল। তবে পরবর্তী যুগে মৌখিক ও অর্বাচীন বা নবীন ভাষা বলে বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাষার আলোচনায় ভারতীয় পণ্ডিতেরা আগ্রহ দেখাননি। ব্যাকরণের আদি উদ্ভব ঘটে প্রাচীন ভারতে ও গ্রীসে। গ্রীক ব্যাকরণ কাঠামো প্রথমে ল্যাটিন ভাষা এবং পরে বিভিন্ন

ইউরোপীয় ভাষা ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ কাঠামো সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়। আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণের মিশ্র কাঠামোতে ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে।

ডঃ হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, 'ভাষাতত্ত্বের অসামান্য বিকাশ ঘটেছিল ধ্রুপদী ভারতে, তবে এই ভাষাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য কোন সহায়তা করেনি বাংলা ভাষাতত্ত্বের উন্মেষে; বরং মনে হয়, সংস্কৃতনিষ্ঠ ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য অনেকটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলা ভাষাতত্ত্বের উদ্ভবে। পাণিনির পরে সংস্কৃত ভাষাতাত্ত্বিকদের নতুন কিছু করার ছিল না ; তখন তাঁদের নিয়তি হয়ে ওঠে ধ্রুপদী ব্যাকরণ গ্রন্থের ভাষ্য আর উপভাষ্য রচনা ও লোকান্তরিত সংস্কৃতের ঠাণ্ডাশীতল সূত্র পর্যালোচনা। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলোর উদ্ভবের পরেও সে ব্যাকরণবিদসম্প্রদায় নিষ্ঠার সাথে পুনরাবৃত্তি করে চলেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণ, তাঁদের চোখে শ্রদ্ধেয় ছিল না ওই অশীল প্রাকৃতটি, যার নাম বাংলা। ওই ভাষা অসংস্কৃত প্রাকৃত মানুষের, তাতে লিপিবদ্ধ হয়নি কোন পুণ্যশ্লোক, তাই ওই ভাষা আকৃষ্ট করতে পারে না কোন ব্রাহ্মণ বৈয়াকরণকে।'

বাংলা ব্যাকরণ চর্চার সূচনা হয় বাংলা ভাষা উন্মেষের আট শ বছর পর। এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে রত পর্তুগিজ পাদ্রি মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ ঢাকার ভাওয়ালে ১৭৩৪ সালে রচনা করেন প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ পর্তুগিজ ভাষায় এবং পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে ১৭৪৩ সালে তা প্রকাশিত হয়। ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে বাংলা শেখার জন্য রচিত এই খণ্ডিত ব্যাকরণ বাঙালিদের প্রভাবিত করেনি। ১৭৭৮ সালে হুগলি থেকে প্রকাশিত হয় ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের ইংরেজিতে লেখা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ —'এ গ্রামার অব দি বেংগল ল্যাংগুয়েজ।'

উনিশ শতকে ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন উইলিয়াম কেরি (প্রকাশকাল ১৮০১), গঙ্গাকিশোর (১৮১৬), কিথ (১৮২০), হটন (১৮২১), রাজা রামমোহন রায় (১৮২৬), শ্যামাচরণ সরকার (১৮৫০), বীম্‌স্ (১৮৭২), শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি (১৮৭৭), যদুনাথ ভট্টাচার্য (১৮৭৯), কে. পি. ব্যানার্জি (১৮৯৩)। এ সময়ের বাংলা ভাষায় রচিত বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতারা হলেন রাজা রামমোহন রায় (১৮৩৩), শ্যামাচরণ সরকার (১৮৫২), ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার (১৮৭৮), নিত্যানন্দ চক্রবর্তী (১৮৭৮), নীলমণি মুখোপাধ্যায় (১৮৭৮), কেদারনাথ তর্করত্ন (১৮৭৮), চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১), প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৮৪), বীরেশ্বর পাঁড়ে (২য় সংস্করণ ১৮৯১), নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ।

বাংলা ব্যাকরণের আদি প্রণেতাগণ বিদেশী ও ভিন্ন ভাষাভাষী হিসেবে ল্যাটিন ও ইংরেজি ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেছেন। পরে সংস্কৃত পণ্ডিতেরা এসে বাংলা ব্যাকরণের নামে সংস্কৃত বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন। এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯২ সনে মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।' উনিশ শতকের শেষদিকে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা কেন্দ্র করে 'নব্য ব্যাকরণবিদগণের' আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সে বৈশিষ্ট্যই চলতে থাকে। তবে নব্য ব্যাকরণবিদেরা সাময়িক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁরা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। বিশ শতকে রচিত বাংলা ব্যাকরণগুলো প্রকৃতি প্রণালীতে আগের শতকের বৈশিষ্ট্যই অনুসরণ করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীনাথ সেন প্রমুখের কেউ কেউ বাংলা ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে বিবেচনা করে ব্যাকরণ বিষয়ের আলোচনা করেছেন। আবার কেউ কেউ বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের সন্তান মনে করে ব্যাকরণ রচনায় সংস্কৃত আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন।

সাম্প্রতিককালে বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, ডঃ সুকুমার সেন, মুহম্মদ আবদুল হাই, ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, ডঃ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, ডঃ হুমায়ুন আজাদ ও আরও অনেকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যনির্ভর ব্যাকরণের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার উপস্থিতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ সন্দেহপ্রবণ। তাই ডঃ হুমায়ুন আজাদ মন্তব্য করেছেন, 'বিশ শতকের আশির দশকেও অবাস্তবায়িত থেকে যায় নব্য ব্যাকরণবিদদের স্বপ্ন, যার নাম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ।'

অনুশীলনী

১। ব্যাকরণ কাকে বলে ? বাংলা ব্যাকরণের অপরিহার্য বিষয়গুলো কি হওয়া উচিত আলোচনা কর।

২। ব্যাকরণের সংজ্ঞা নিরূপণ করে বাংলা ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করার কাঠামো পেশ কর।

৩। ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি ? আলোচনা কর।

৪। 'ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কারের নামই ব্যাকরণ।'—আলোচনা কর।

৫। 'ভাষা ব্যাকরণকে অনুসরণ করে না, ব্যাকরণই ভাষাকে অনুসরণ করে।'—আলোচনা কর।

৬। 'ব্যাকরণ ভাষাকে চলতে নির্দেশ দেয় না, কিংবা শাসন করে না, বরং ভাষাই ব্যাকরণকে শাসন করে বা চলতে নির্দেশ দেয় কিংবা ব্যাকরণ ভাষার বর্ণনা করে মাত্র।'—আলোচনা কর।

৭। 'ব্যাকরণ ভাষাকে শাসন করে না, বরং ব্যাকরণকে ভাষাই শাসন করে। যাঁরা এর বিপরীত ধারণা পোষণ করেন, তাঁরা ব্যাকরণের মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত নন বলে ভ্রান্ত।'—বৈয়াকরণিক দৃষ্টিতে উক্তিটি আলোচনা কর।

৮। 'যে পুস্তক পাঠ করিলে ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায় তাহাকে ব্যাকরণ বলে।'—এই মতের সাথে তুমি কি একমত ? এক মত হলে প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা দাও ; না হলে ব্যাকরণের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদান কর।